অতিথি

তাসনিম চৌধুরী নওশীন

সুমি স্কুল থেকে ফিরে দেখে, সকালে আসা লাল কুকুরটি তখনও বসে আছে বাসার গেটের বাইরে। সুমিকে দেখে পোষা কুকুরের ন্যায় মাথা ও লেজ নেড়ে কুঁই...কুঁই... করতে লাগলো। তখন পেছনে মাকে উদ্দেশ্য করে সুমি বলল, মা দেখো, কুকুরটি এখনও যায়নি। এলো কোত্থেকে?

সুমির মা বললেন, বোধ হয় অন্য কোনো এলাকা থেকে এসে রাস্তার কুকুরের কামড় খেয়ে ছুটে এসেছে। এখন ভয়ে যেতে পারছে না। সুমি খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এটাকে না হয় বাসায় রেখে দেই। মনে হয় থাকবে।

- তোর বাবা যদি রাগ করে?

- বাবাকে আমি বলবো।

ঘরে গিয়ে সুমি দুটো রুটি এনে ককুরটিকে ডাক দিলে সে ধীরে ধীরে বাসায় ঢুকে একটু থমকে দাঁড়ায়। তারপর সুমির কাছ এসে লেজ নাড়তে থাকে। সুমি রুটি দুটো সামনে রাখলে সে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষে কুকুরটি সেখানে বসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। তখন পাশের বাসার একটি বিড়ালকে আসতে দেখে সে ঘেউ... ঘেউ করে ছুটে তাড়িয়ে দিলো। তারপর বাসার চারদিকে কিছুক্ষণ ঘেউ... ঘেউ করে অদৃশ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেন হুঁশিয়ারি জ্ঞাপন করলো।

কয়েক দিনের মধ্যে কুকুরটির বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। সুমিদের একতলা বাসায় প্রতিদিন ভিক্ষুকদের উপদ্রব কুকুরটির তৎপরতায় অনেক হ্রাস পায়। এ ছাড়া বাসায় কোনো অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অপরদিকে কুকুরটি সুমির দারুণ ভক্ত হয়ে ওঠে। রোজ স্কুল থেকে সুমি ফিরে এলেই কুকুরটি ছুটে এসে মাথা ও লেজ নেড়ে অস্পষ্ট আনন্দধ্বনি বের করে। তারপর পায়ের কাছে শুয়ে উ..উ...করতে থাকে। সুমি তখন মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে সে চোখ বুজে থাকে। তারপর সুমি স্কুলের টিফিন বক্স খুলে কুকুরটির জন্য রোজ রেখে দেয়া একটু খাবার বের করে দিলে সে মজা করে খায়।

দু'মাস পর একদিন সুমির বাবা বললেন, শীঘ্রই তাদের এ বাসা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ এটা ভেঙে ফেলা হবে। সুমি তখন বলল, আমাদের কুকুরকেও নতুন বাসায় নিয়ে যাব। শুনে, সুমির বাবা বললেন, ওখানে তিন তলা ফ্ল্যাটে কুকুরের জায়গা কোথায়? কুকুর নেয়া যাবে না।

তিনদিন পর বাসার জিনিসপত্র বাঁধার কাজ শুরু হলে কুকুরটি দরজার কাছে এসে বারবার লক্ষ্য করে। সুমি স্কুল থেকে এসে কুকুরটিকে আদর করলে সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সেদিন থেকে রোজই গভীর রাতে কয়েকবার শোনা যায় কুকুরটির কান্না।

শুক্রবার। নতুন বাসায় সব জিনিসপত্র নেয়া শেষ হলে সুমির বাবার অফিসের একটা গাড়ি এলো তাদের নিয়ে যেতে। গাড়িতে ওঠার আগে সুমি চোখের জলে কুকুরটির মাথায় হাত বুলায়। কুকুরটি তখন সবার মুখের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

সবাই গাড়িতে ওঠে দরজা বন্ধ করে দিলে কুকুরটি হঠাৎ দুই পায়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কুঁই...কুঁই... করতে লাগলো। সুমি তখন কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, বাবা, কুকুরটা থাকবে কোথায়? ওকে নিয়ে চলো। সুমির বাবা বললেন, পথের কুকুর পথেই থাকবে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে কুকুরটিও পেছনে ছুটতে লাগলো। সুমি কাচের ভেতর দিয়ে পেছনে ছুটে আসা কুকুরটির দিকে তাকিয়ে রইল। বড় রাস্তায় এসে গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেলে কুকুরটিও প্রাণপণে ছুটতে লাগলো। হঠাৎ একটি মাইক্রোবাসের চাপায় পেছনে কুকুরটির আর্তচিৎকার ভেসে এলো। সুমি তখন পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলল, গাড়ি থামাও..., আমাদের কুকুর গাড়ি চাপা পড়েছে...।

গাড়ি ঘুরিয়ে কুকুরটির কাছে নিয়ে গেলে সুমি দ্রুত নেমে গিয়ে রক্তাক্ত কুকুরটির মাথায় হাত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। কুকুরটি একটু চোখ মেলে সুমিকে দেখে ধীরে ধীরে লেজ নাড়ে। তারপর হঠাৎ নিথর হয়ে যায়।

লেখক পরিচিতি
পিতা : এস.এ. চৌধুরী
হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল
ষষ্ঠ শ্রেণী
৯৩, তেজকুনিপাড়া (৫ম তলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

তপুর স্বপ্ন সবুজ নগরী

মাহপারা নাফিসা আনজুম বুশরা

শ্রাবণের আকাশ থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরছে। তপু জানালার গ্রিল ধরে আনমনে তাকিয়ে আছে সামনের বাগানটার দিকে। বাগানে কত সুন্দর সুন্দর গাছ। বৃষ্টির পানিতে তাদের সবুজ পাতাগুলো চিক চিক করছে। খালার এই বাসাটা তপুর খুব পছন্দ এই গাছগাছালির জন্য। তাদের দম বন্ধ করা ফ্ল্যাট বাসা থেকে এখানে এলে তার মন আনন্দে নেচে ওঠে। তপুর মা বাবা ঢাকা গেছেন। অফিসের কাজে। আর তাই খালার বাসায় তাঁকে রেখে গেছেন। তপুর ভালোই লাগে এই জানালার পাশে বসে প্রকৃতি দেখা। তবুও মামণি বাপির অনুপস্থিতি তাকে পীড়া দেয়। ও বিষণ।ন মনে বসে বসে প্রকৃতি দেখে। খালামণি কখন সামনে এসেছে টেরই পায়নি। আদর করে মাথায় হাত ছোঁয়ালে সে চমকে ওঠে। খালা এটা সেটা কথার পর বলেন, 'এক কাজ কর তপু, এই বৃষ্টি এই প্রকৃতি নিয়ে তুই একটা সুন্দর গল্প লিখতো, দেখি কেমন হয়।' তপু প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তারপর কখন যে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে যায়। সে লিখে-

'নীল কমল নামে ছোট্ট গ্রাম, সে গ্রমের মেঠো পথের দুধারে সারি সারি গাছ। মাঠের পর মাঠ সবুজ ফসল। মাটির উঠোন, পুকুর, তার চারপাশে আম, জাম, কাঁঠালের গাছ, পেয়ারা গাছে কাঠবিড়ালির নাচানাচি, চারদিকে বাঁশ করমচা গাছের সারি, ফুলের সুবাস। সে গ্রামেরই ছোট্ট মেয়ে শিলা। যার অনেকগুলো মাটির পুতুল ছিল। এদের নাম শালিক, ময়না, টিয়া, চড়ুই। সে স্কুল বন্ধের দিন আম বাগানে বসে তার পুতুল নিয়ে 'রান্নাবান্না', 'সংসার সংসার' খেলায় মেতে উঠতো। তার সঙ্গে খেলতে আসতো ছোট ভাই পিনু, পাশের বাড়ির রুমি, সুমি, কচি, মনা সবাই। সেদিনও তেমনি খেলছিল ওরা। কেউ আমপাতা ছিঁড়ে বাড়ি সাজাচ্ছে, পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে ঘর বানাচ্ছে, কেউবা গাছের ফুল ছিঁড়ে আনছে। ওরা সবাই আনন্দে আত্মহারা। হঠাৎ সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের স্কুলের সবচেয়ে প্রিয় স্যার রফিক স্যার। যিনি সুন্দর করে পড়ান এবং বলেন- মানুষের সেবা করবে, জীবের সেবা করবে, প্রকৃতিকে ভালোবাসবে, সত্যিকার মানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে। স্যারকে দেখে সবাই দৌড়ে গিয়ে স্যারকে নিয়ে আসে তাদের খেলনা ঘরে খাওয়ানোর জন্য। খেলনা ঘরে এসেই স্যার চমকে উঠেন, বলেন, 'এসব তোমরা কি করছো?

সবাই এক সঙ্গে বলে, 'কি স্যার?'

তিনি বলেন, 'এত ফুল পাতা ছিঁড়েছো, ডাল ভেঙেছো কেন?'

ওরা হাসি মুখে বলে, 'খেলার জন্য, কেন? কি হয়েছে স্যার?'

স্যার সবাইকে বসতে বলেন। তারপর বলেন, 'তোমরা জান না, আমাদের যেমন প্রাণ আছে, গাছের তেমনি প্রাণ আছে। আমরা যেমন খাই, গাছও তেমনি খায়। আর গাছে যে ফুল ধরে তা থেকে ফল হয়। তাই গাছের ফুল ছিঁড়ে নিলে ফল হবে কিভাবে? তাছাড়া যে গাছ আমাদের জীবন বাঁচায় অক্সিজেন দিয়ে, তাকে আমরা কষ্ট দেব কেন?'

স্যার আরো বলেন, 'তোমরা জানো না গাছ না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।' স্যারের কথায় সবার মন বিষণ্ন হয়ে যায়। সবাই দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। বলে, 'স্যার আমরা আর কখনো এমন কাজ করবো না।'

স্যার বললেন, 'শুধু তাই নয়, আমি চাইব তোমরা সবাই যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই গাছ লাগাবে। লাগাবে তো?'

স্যারের কথায় সবাই সম্মতি জানালো। পরদিনই শিলারা বাড়ির চারপাশে অনেক গাছ লাগালো তাদের দেখে বড়রাও এগিয়ে আসে। এভাবে অনেক গাছ লাগানো হয়। তাই আজ সবুজ গাছের সারি আর গাছে গাছে পাখির কাকলিতে মুখরিত নীল কমল গ্রাম। সেখানে শিলা ও তার বন্ধুরা সুস্থ সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠছে।

তপু তার স্বপ্নের পৃথিবীর কথা গল্পটায় বলে একটা তৃপ্তি অনুভব করে। সে লজ্জা মেশানো অনুভূতি নিয়ে খালার হাতে গল্পটা তুলে দেয়।

খালা 'বাহ! চমৎকার' বলে সেটা পাঠিয়ে দেন 'নিডো সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো গল্প জেতো প্রতিযোগিতা'তে।

কিছুদিন পর হঠাৎ ডাকপিয়ন তপুর নামে একটা চিঠি নিয়ে আসে। সে গল্প লেখো গল্প জেতো প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। তপু আনন্দে অভিভূত হয়ে ওঠে। সে চিৎকার করে মামণি বাপিকে বলে তার সাফল্যের কথা। আর স্বপ্ন দেখে একদিন গল্পের শিলার মতো সেও গাছ লাগিয়ে সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলবে। নিজের জন্য, অন্যের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য।

লেখক পরিচিতি
পিতা : মোঃ আবদুল মতিন
ব্লু বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়
পঞ্চম শ্রেণী
বিথীকা এ/১২, ফুলসাইন্দ ভিলা,
লামাবাজার, সিলেট

স্বপ্ন

সানজানা সায়াহ্নিতা

অন্তর গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে। সবাই যখন অবসর সময়ে কার্টুন ছবি দেখে, অন্ত তখন মাকে শোনাতে বলে। মা যখনই অবসর থাকেন তখনই তাকে গল্প শোনান। অন্তর মা খুব ভালো, খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারেন। প্রতি রাতেই ঘুমুতে যাওয়ার আগে তিনি অন্তকে একটা না একটা গল্প বলেন।

এভাবে মার মুখ থেকে গল্প শুনতে শুনতে অন্ত নিজেও গল্প বলা শিখে যায়। কিন্তু মা বলেন, তোমাকে গল্প লিখতে হবে। মা তাকে অনেক গল্প বলেন, কিন্তু অন্ত যে কোন গল্প লিখবে সেটাই ভেবে পায় না। একদিন ওর মাথায় একটা গল্পের ধারণা আসে। অন্ত সেটা লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু মা যেভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে বলেন অন্ত মোটেও সেভাবে গুছিয়ে লিখতে পারে না। সে লিখে, বারবার কাটে, আবার লিখতে শুরু করে। নাহ্, এবারও হচ্ছে না। অবশেষে অন্ত মাকে তার গল্পটা আর তার সমস্যাটা বলে। মা বলেন, ঠিক আছে, আমি আগামী কাল থেকে তোমাকে সাহায্য করব।

সেদিন রাতে অন্ত খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে। সে দেখে, মা তাকে গল্পটি গুছিয়ে লিখতে সাহায্য করেছে। অন্ত সেটা সুন্দর করে লিখে একটা গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দিল। অবশেষে একদিন পত্রিকায় সেই প্রতিযোগিতার ফলাফল দেয়া হল। অন্ত দেখল, সে গল্প লেখায় প্রথম হয়েছে। পত্রিকায় তার গল্পটি ছাপানো হয়েছে।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে অন্ত তার গল্পটি লিখতে বসল। মা তাকে গুছিয়ে লিখতে সাহায্য করল। অন্ত খুব মনোযোগ দিয়ে লিখতে লাগল। সে মনে মনে ঠিক করল, এই গল্পটা লিখে সে একটা গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় পাঠাবে।

এভাবে লিখতে লিখতে গল্পের প্রায় অর্ধেকটা লেখা শেষ হয়ে যায়। একদিন হঠাৎ অন্তর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার প্রচন্ড মাথাব্যথা। সেদিন অন্তর আর গল্প লেখা হলো না। পরদিন যখন দেখা গেল মায়ের অবস্থা আরও খারাপ তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। অন্তর খুব মন খারাপ হয়। আব্বু আর বড় আপু আম্মুর সঙ্গে হাসপাতালে থাকবেন। অন্ত আর কাজের বুয়া বাসায় থাকবে। এখন কে তাকে গল্পটা লিখতে সাহায্য করবে? কে তাকে গল্প শোনাবে?

অন্তর মা যখন আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ডাক্তার বললেন, মাথায় একটা অপারেশন করতে হবে। অন্তর খুব কান্না পেল। মা'র যদি অপারেশন হয় তবে তাকে আরও অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। অন্ত নিজেও গল্পটা শেষ করতে পারছে না, গল্পটার নামও দেয়া হয়নি। এদিকে সেই গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় গল্প জমা দেবার নির্ধারিত দিন শেষ হয়ে আসছে, আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। অন্তর কি তাহলে আর গল্প জমা দেয়া হবে না?

শেষ পর্যন্ত মাকে আরও পনেরো দিন হাসপাতালে থাকতে হলো। তবে তিনি আগের মত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। অন্তর আর গল্প পাঠানো হলো না।

অবশ্য অন্ত এখনও স্বপ্ন দেখে সে গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, পত্রিকায় তার গল্পটা ছাপানো হয়েছে। আম্মু সুস্থ হয়ে গেছেন, তিনি অন্তকে নিয়ে সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে নিয়ে যাচ্ছেন।

লেখক পরিচিতি
পিতা : মোঃ রফিকুর রহমান
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
ষষ্ঠ শ্রেণী
খ (ই)৮/৪, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী
ফরিদাবাদ, ঢাকা

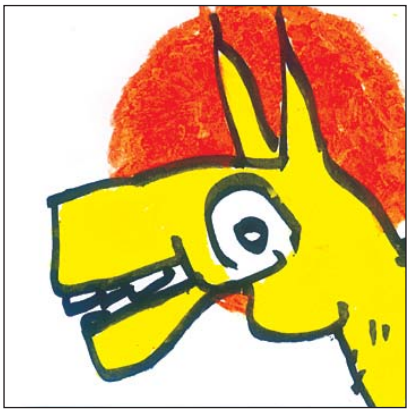

গাধার গানের দল

শায়লা তাসনিম শিমু

এক ছিল চাষী। তার ছিল একটা গাধা। গাধার অনেক বয়স। সে আর আগের মত বোঝা বইতে পারে না। সারাদিন ঘুমায় আর গুন গুন করে গান গায়। চাষী দেখলো এতো খুব বিপদ। তার চেয়ে গাধাটাকে বেচে দিই। কিছু নগদ টাকা পাওয়া যাবে। বিকেল বেলা চাষীর কসাইয়ের সঙ্গে কথা হল। গাধা সব শুনল এবং ভয় পেল। রাতে চাষী ঘুমিয়ে আছে। গাধা চুপি চুপি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। গাধা মনে মনে ঠিক করল সে শহরে যাবে। শহরে গিয়ে গানের দল করবে।

কুকুর হল সাথী

গাধা দেখলো রাস্তার পাশে বসে হাঁপাচ্ছিল একটা বুড়ো কুকুর। গাধা কুকুরের কাছে গিয়ে বলল, কিগো ভাই অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন। কুকুর বলল, কী আর বলব। বুড়ো হয়ে গেছি। গায়ে জোর নেই। তাই আগের মত শিয়াল তাড়া করতে পারি না। ফলে মালিক তাড়িয়ে দিয়েছে। গাধা বলল আমার অবস্থাও তোমার মত। চল আমরা শহরে যাই। সেখানে গিয়ে গানের দল করবো। তোমাকে ঢোল বাজাতে দেব। গাধা ও কুকুর হাঁটতে শুরু করল।

এবার এল বিড়াল

হঠাৎ তারা দেখল রাস্তায় বসে মিউমিউ করছে এক হুলো বিড়াল। তারা কাছে গিয়ে বলল ও হুলো ভাই, ওভাবে কাঁদছো কেন। বৌ মরেছে নাকি। হুলো বিড়াল বলল, না ভাই। মনের দুঃখে কাঁদছি। বুড়ো হয়ে গেছি। গায়ে জোর নেই। তাই তেমন ইঁদুর ধরতে পারি না। ইঁদুরেরা আমার গোঁফ ধরে ঝোলে। লেজ দিয়ে পেটে সুড়সুড়ি দেয়। কাল শুনলাম মালিক বলছে আমাকে নদীতে ফেলে দেবে। ভাবছি এই বুড়ো বয়সে কোথায় যাব? কী খাব? কুকুর বলল, আমাদের দশাও তোমার মতো। গাধা দাদা আমাকে নিয়ে শহরে যাচ্ছে। তুমিও চল। তারপর তারা তিন জন হাঁটতে লাগল।

মোরগ এল দলে

হাঁটতে হাঁটতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তারা একটা বাড়ির সামনে এল। হঠাৎ দেখতে পেল একটা মোরগ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। তারা বলল, অমন করে চেঁচামেচি করছো কেন? মোরগ বলল, অভিশাপ দিচ্ছি। কাল এ বাড়ি কুটুম আসবে। তাই কাল আমাকে জবাই করা হবে। তাই গিন্নিকে অভিশাপ দিচ্ছি। গাধা বলল আমাদের সঙ্গে চল। একথা শুনে মোরগ ভরসা পেল।

এবার দুই দল

চারজন এল একটা বাড়ির কাছে। বিড়ালের গায়ে একটা মশা কামড়ে দিল। বিড়াল ফসফস করে উঠল। কুকুর বললো হুলো দাদা শব্দ কর না। গাধা জানালা দিয়ে ঘরে উঁকি মারল। দেখল ঘরের মধ্যে অনেক খাবার তিন জন ডাকাত খাচ্ছে। গাধা মতলব আঁটল ডাকাতদের ভয় দেখাবে। গাধার পিঠে কুকুর, কুকুরের পিঠে বিড়াল, বিড়ালের পিঠে মোরগ উঠল। গাধা ডাকল ব্যা- এ্যা- এ্যা...। কুকুর ডাকল- ঘেউ ঘেউ ঘেউ। বিড়াল ডাকল- মিউ মিউ মিউ। মোরগ ডাকল কু-ক-কু-রু কুক্। সেই ডাক শুনে ডাকাতরা ভয়ে পালাল বনের মধ্যে। আর কেনোদিন ফিরে এল না।

বাঁচাও বাঁচাও

এদিকে ডাকাতরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। ডাকাতদের সর্দার বলল দেখে আসি ঐ বাড়িতে কারা আসল। সর্দার রান্নাঘরে গিয়ে আলো জ্বালাতে বিড়াল অমনি তার নাক কামড়ে ধরল। সর্দার ছুটে এল দরজায়। সেখানে ছিল কুকুর। কুকুর ডাকাতের পা কামড়ে ধরলো। ডাকাত চিৎকার করে উঠানে গেল। উঠানে ছিল গাধা। গাধা দিল এক লাথি। ঘরের চালে ছিল মোরগ। সে উড়ে মোরগের ঘাড়ের ওপর পড়ল। সর্দার বনে দৌড়ে এসে বলল ঐ বাড়িতে দৈত্য ও ডাইনি এসেছে।

খাও দাও আর গান কর

পরদিন সকালে গাধা, কুকুর, বিড়াল ও মোরগ নাশতা খেতে বসল। গাধা বলল সবাই পেট ভরে খেয়ে নাও। শহরে যেতে হবে। এমন সময় বিড়াল মিউ মিউ করে বলল, দাদা আমার একটা কথা আছে। গাধা বলল, বল। বিড়াল বলল, এখানে অনেক খাবার আছে। এই বুড়ো বয়সে আমাদের আর শহরে গিয়ে লাভ নেই। এত খাবার সারা বছরেও শেষ হবে না। তারা সবাই কথায় সম্মত হল এবং সেখানে গানের দল করল। তাদের গানের সুরে বনের পশুপাখিরা ভয়ে ছুটে পালাল।

লেখক পরিচিতি
পিতা : সৈয়দ সেলিমউদ্দৌলা
সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ষষ্ঠ শ্রেণী
যশোর

সূর্য উদয়

আই. এম. এম সিরাজুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীন একটি দেশ পেয়েছি- তাদের উপর ভিত্তি করেই এই গল্প।

আমাদের বাড়ির নিয়ম হল ছোটদের ৬টার মধ্যে বাড়ি ফেরা। ছোট চাচা বেকার। বড় চাচা একজন ডাক্তার। ওনার চোখ ফাঁকি দেয়া অনেক কঠিন। বন্ধুরা মিলে কিছু প্ল্যান করে বাড়ি গেলাম। যদিও নিয়ম ৬টা, তবে এখন বাজে সাড়ে সাতটা। বড় চাচা বললেন, কি ব্যাপার দেরি হল কেন? বললেন, তুমি সিনেমা দেখলে নাকি? পরে রাতের বেলা উনি খুব কঠোর স্বরে বললেন, তুমি আমাকে আধঘন্টার মধ্যে লিখে দেবে তুমি কি করেছ? কোন উপায় না দেখে আমি সত্যি কথাই বিস্তারিতভাবে লিখলাম। আমরা এক বাহিনী গঠন করেছি পাকিস্তানিদের ঠেকানোর জন্য। বড় চাচা আমাকে বললেন যে, উনি আমাদের বাহিনীর সাথে দেখা করতে চান। পরদিন সবাই বাড়ি এল। বড় চাচার সাথে অনেক কথা হল। উনি আমাদের কিছু নির্দেশনা দিলেন। এরপর আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা পরদিন স্কুলে নেয়া হবে ঠিক হল। সে দিন গিয়ে দেখি স্কুল বন্ধ। হেড স্যার বললেন, বাসায় গিয়ে একা একা পড়। সেখান থেকে আমি গেলাম মনিরের বাসায়। মনির বলল, 'বাবা স্যার রেখেছেন'। বাইরে যাওয়া নিষেধ। বেলা ১১টায় মিছিল আছে। তাই আজ আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে চুপচাপ বসে রইলাম।

আমাদের বাড়িতে এখন অনেক কিছু বদলে গেছে। বড় চাচা কারো সাথে কথা বলেন না। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকেন। মার অসুখ হওয়ায় একজন নার্স এসে রাতে বাসায় থাকেন। বাসাটা কেমন যেন শব্দহীন হয়ে গেছে। আজ সকালে ফুপার আসার কথা, কিন্তু উনি আসলেন রাতে। ফুপার মেয়ের খুব জ্বর। উনি রিকশায় করে আসার সময় চেকপোস্টে থামতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত জ্বরের জন্য ছেড়ে দিয়েছে মিলিটারিরা। ফুপার মেয়ে এখন বাড়িতে ভয়ে শুধু কাঁদে।

আমি বশিরের বাসায় গেলাম। আজ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ দেওয়ার কথা। ঠিক করেছি একসঙ্গে শুনব এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পরিকল্পনা করব।

কিন্তু হায়! মিলিটারিদের অত্যাচারে বশির বাড়ি ছাড়া হল। ওদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে হানাদার বাহিনী। মনির পরিবারের সাথে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। এভাবে সবাই আলাদা হল। আমাদের একসঙ্গে আর যুদ্ধ হল না।

২৫ শে মার্চ রাতে মিলিটারিরা পশুর মত লোক মারল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ৩০ লাখ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অন্ধকার বাংলার আকাশে এক নতুন বিজয়ের সূর্য উদয় হয়। আমরা সফল হয়েছি।

লেখক পরিচিতি
পিতা : মোহাম্মদ মঈন
স্কলাস্টিকা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
সেকশন-গ, রোলং-২৭
বাড়ি নং- ৬৪, সড়ক নং-৭
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট